পঞ্চম অধ্যায়

পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ পূর্ব তিমুরের তেল, গ্যাস কয়লা ইত্যাদি সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয়ের বৃহৎ অংশ ইন্দোনেশিয়ার রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজে ব্যয় হতো। ফলে পূর্ব তিমুরের লোক তাদের অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে ব্যাপক সহিংসতার প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় পূর্ব তিমুর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। *◀শিখনফল-১*

ক. সিপাহি বিদ্রোহ কত সালে সংঘটিত হয়?

খ. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কেন গঠিত হয়?

গ. উদ্দীপকে ইন্দোনেশীয় সরকারের আচরণে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়ার অনুরূপ — এ বাক্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতামত দাও।

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৭ সালে সংঘটিত হয়।

খ বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। তারা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার মাধ্যমে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠির উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে ছাত্র সমাজ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচি হিসেবে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে এতে মিছিলে পুলিশ এলোপাথারি গুলি চালালে অসংখ্য ছাত্র নিহত হয়। এভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

গ উদ্দীপকে ইন্দোনেশীয় সরকারের আচরণে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের বৈষম্যমূলক আয়ের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিকগুলো ফুটে উঠেছে।

পূর্ব পাকিস্তানিদের চরম দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য। ১৯৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় ৩২% বেশি। ১৯৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে এ পার্থক্যের পরিমাণ কমে দাড়ায় ৬১%। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে থাকায় অতিসহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল হেড অফিস পশ্চিম, পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় উদ্বৃত্ত আর্থিক সঞ্চয় জমা থাকত পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়ে উঠতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানে ভারি ও ব্যয়বহুল শিল্প কারখানার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদারভাবে অর্থ বরাদ্দ থাকত। ফলে পূর্ব পাকিস্তানিরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হয়। তাছাড়া পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের শিক্ষাক্ষেত্রের বৈষম্য ছিল আরও বেদনাদায়ক। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখন আনুপাতিক হারে স্কুলের সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছিল।

এভাবে শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা বৈষম্যের শিকার হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ব্যাপক আন্দোলনের ডাক দেয়।

ঘ উদ্দীপকে পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়ার অনুরূপ। এ বিষয়ে আমি একমত পোষণ করছি।

১৯৪৭ সালের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি নানা বৈষম্যেমূলক আচরণ প্রদর্শন করে আসছিল। ১৯৬২-৬৫ সালের দিকে এসে এ বৈষেম্যের মাত্রা ব্যাপক আকার ধারণ করে। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হতে থাকে। এসব বৈষম্যের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলগুলো এক সম্মেলনে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। এ ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতির মহামুক্তির সনদ। এতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্যিক, আমদানি ও রপ্তানি প্রভৃতি অধিকারের কথা বলা হয়। এ ছয় দফা আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে আইয়ুব সরকার ১৯৬৮ সালে আগতরলা মামলা দায়ের করে বঙ্গবন্ধুসহ ও ৩৫ জন নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আন্দোলনে ফেটে পরে। ১৯৬৯ সালে তারা এক গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করে। এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তারা জাতির নেতাদের মুক্তি ও আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটায়। এর পর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তারা আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে বিজয় করে। তবে পাকিস্তানি শোষকবর্গ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অনীহা প্রকাশ করায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। এভাবে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

প্রশ্ন ▶২ তৌফিক হাসান একটি ঐতিহাসিক মামলার ওপর স্বল্পদৈর্ঘ্য ছায়াছবি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন। স্ক্রিপ্টের ঘটনা হলো— একটি জাতির কল্যাণে আবির্ভাব ঘটবে এক মহান নেতার এবং তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে উক্ত জাতিকে শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি দিতে চাইবেন। ফলশ্রুতিতে তিনি সরকারের রোষানলে পড়বেন এবং ৩৪ জন সহযোগীসহ এক রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় জড়াবেন। পরিশেষে ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে তিনি মুক্তি লাভ করবেন। *◀শিখনফল-২*

ক. ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে? ১

খ. আগরতলা মামলার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. স্ক্রিপ্টটি কোন ঐতিহাসিক মামলার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মহান নেতা দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক- পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

খ আগরতলা মামলার বিকারকার্য পরিচালনার জন্য যে ট্রাইবুনাল গঠন করা হয় তাই এ মামলার বিশেষ ট্রাইবুনাল বলে পরিচিত।

এ ট্রাইবুনালের প্রধান ছিলেন পাকিস্তানের বিচারপতি এস এ রহমান। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রধান কৌসুলি ছিলেন মনজুর কাদের এবং টি এইচ খান। বিশেষ ট্রাইবুনালে অভিযুক্তদের আইনজীবীদের নিয়ে একটি ডিফেন্স টিম গঠন করা হয়। এছাড়া স্যার টমাস উইলিয়াম বঙ্গবন্ধুর পক্ষের আইনজীবী ছিলেন।

গ উদ্দীপকের স্ক্রিপ্টটি ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের তৌফিক হাসানের স্ক্রিপ্টে দেখা যায়, একটি জাতির কল্যাণে এক মহান নেতার আবির্ভাব ঘটবে। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে সে জাতিকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এর ফলে তিনি সরকারের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ৩৪ জন সহযোগীসহ একটি রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় জড়াবেন। কিন্তু ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে তিনি মুক্ত হবেন। আগরতলা মামলার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতিকে শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামরিক ও সামাজিকসহ নানা ক্ষেত্রে শোষণ ও নির্যাতন করে। এসব অন্যায় থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবির্ভাব ঘটে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত ছয়দফা দাবি উত্থাপন করেন। এর ফলে তৎকালীন সরকার তাঁকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়। অবশেষে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা করে, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। এটিই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে পরিচিত। কিন্তু প্রবল গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকার মামলা প্রত্যাহার ও বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানে বাধ্য হন।

তাই বলা যায় যে, তৌফিকের স্ক্রিপ্টটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের মহান নেতা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল পথ প্রদর্শক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের বাঙালি জাতির দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে সচেষ্ট হন। এজন্য তিনি জীবনের ঝুঁকি নিতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। এতে তাঁর দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উদ্দীপকের মহান নেতার ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রবল দেশপ্রেম লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের মহান নেতা জাতির কল্যাণের জন্যই নিজেকে বিলিয়ে দিতে চান। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে সে জাতিকে শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার প্রচেষ্টা চালান। ফলশ্রুতিতে তিনি সরকারের রোষানলে পড়েন। স্বদেশের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধের কারণেই তিনি নিজ স্বার্থকে উপেক্ষা করে জাতির স্বার্থে মনোনিবেশ করতে পারেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন বৈষম্যের কথা জনসম্মুখে তুলে ধরেন। আইয়ুব খান শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলনে ভীত হয়ে বার বার তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের ওপর নির্যাতন চালায়। কিন্তু কোনোভাবেই তাঁকে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার চিন্তা থেকে বিরত রাখা যায় নি। বঙ্গবন্ধু আন্তরিক দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার চিন্তা করেন। এ কথা স্বৈরাচারী সরকারের কানে গেলে তারা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করে তাকে কারারুদ্ধ করে। তবে তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নির্ভেজাল প্রচেষ্টার ফলে বাংলায় স্বাধীন সূর্য উদিত হয়। দেশকে ভালোবেসেছিলেন বলেই দেশের মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর এতো খানি ত্যাগ স্বীকার করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর আদর্শ দেশপ্রেমের পরম মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়েই সকল বাঙালি বিপদকে তুচ্ছ করে বাংলাকে শত্রুমুক্ত করেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকের মহান নেতা এবং বঙ্গবন্ধু দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল পথ প্রদর্শক।

প্রশ্ন ▶৩ সমীর একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র দেখছিল। ছবিতে একটি অঞ্চলের জনগণের সংগ্রামের ঘটনা দেখাচ্ছিল। ঐ অঞ্চলের জনগণের সাহস, বুদ্ধি ও সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সরকারের একপেশে নীতির কারণে সরকারে তাদের কোনো প্রতিনিধি নেই। তারা চাকরি, শিক্ষা ও অর্থনীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত। তাদের বঞ্চনা ও শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন এক আপোসহীন নেতা। তিনি জনগণের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক পরিচালনার ক্ষমতা, প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক, সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক আইন সভা গঠন, রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা— ইত্যাদি উক্ত অঞ্চলের হাতে দেওয়ার দাবি জনান। ◀*শিখনফল-২*

ক. আগরতলা মামলা দায়েরের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? ১

খ. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার দাবিনামায় বঙ্গবন্ধুর কোন কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটেছে- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উল্লেখিত দাবিনামা বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল- বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগরতলা মামলা দায়েরের মূল্য উদ্দেশ্য ছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে দমিয়ে রাখা।

খ ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। আত্মনির্ভরশীল কলেজগুলোকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি প্রত্যাহার করা এবং জগন্নাথ কলেজকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এছাড়া ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রবর্তন করার জন্যও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এছাড়া দেশে যখন নেতৃত্বদানের অভাব দেখা দেয় তখন ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল।

গ উদ্দীপকের বর্ণিত নেতার দাবিনামায় বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দাবি ও কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটেছে।

১৯৬৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা দাবি পেশ করেন। এ ছয়দফার প্রথম দফায় ছিল বাঙালি জাতির প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি। দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র দুটি বিষয় থাকবে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অন্য সকল বিষয়ে স্টেটসমূহের পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। তৃতীয় দফায় বলা হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন থাকবে। নতুবা একটি মুদ্রা থাকলে দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। চতুর্থ দফায় বলা

হয় যে, সকল প্রকার কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। পঞ্চম দফায় আঞ্চলিক সরকারের আমদানি ও রপ্তানি ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের কথা বলা হয়। ষষ্ঠ দফায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করার কথা বলা হয়।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত বিষয় অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা দাবিনামায় বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

১৯৫৬ সালে উপস্থাপিত ছয়দফা দাবি ছিল বাঙালি জাতির স্বকীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ আর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি। এ ছয় দফা কর্মসূচি প্রকাশিত হবার সাথে সাথে সরকার ও দক্ষিণপন্থি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। দক্ষিণপন্থি দলগুলো এর অপব্যাখ্যা করে আওয়ামী লীগকে বিচ্ছিন্নতাবাদীরূপে চিহ্নিত করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পায়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান স্বয়ং ৬ দফার বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করার হুমকি দেন। শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে পাকিস্তান দেশ রক্ষা আইনের ফলে ১৯৯৬ সালের ৮ মে আটক করা হয়। এর ফলে ঢাকা শহরে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। জাতীয় পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ এর তীব্র নিন্দা করেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ১৩ মে প্রতিবাদ দিবস পালন করে। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন সারা প্রদেশে হরতাল পালিত হয়। সর্বত্র কলকারখানা বন্ধ ও নাগরিক জীবন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। সরকার জনগণের এ স্বতঃস্ফূর্ত হরতালকে সহ্য করতে পারল না। ধর্মঘটে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ ও E.P.R. বাহিনী একদিন বিভিন্ন স্থানে ছাত্র জনতার ওপর গুলি চালায়। ফলে ১১ জন নিহত ও বহুলোক আহত হয়। ফলে বাঙালি আরও ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে ও চারদিকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৬৮ সালে দায়ের করা আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে সরকারকে বাধ্য করা হয়। আর এরই পরিক্রমায় সংঘঠিত হয় ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান।

এভাবে কালক্রমে ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা। এভাবে ছয়দফায় বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলনের বীজ বপিত হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪ উত্তর আমেরিকার একটি দেশে ৪টি দল মিলে একটি জোট গঠন করে এবং নির্বাচনে জয়লাভ করে। জোটটি নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে। তারা দেশের জনগণকে কিছু প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। যার মধ্যে রয়েছে সকল প্রকার দুর্নীতি নির্মূল করা হবে, সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে, কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে, বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন করা হবে, নিয়মিত ও অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। ◀ *শিখনফল-২*

ক. কত সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দাবিগুলোর সাথে তোমার পঠিত কোন বিষয়ের দাবির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'এ প্রতিশ্রুতি বাঙালি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটতে সক্ষম'— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়।

খ ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রণীত গণতন্ত্রকে মৌলিক গণতন্ত্র বলা হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে চল্লিশ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে চল্লিশ হাজার প্রতিনিধি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে পারেন। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের রাষ্ট্রপতি, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। এতে জনগণের ভোটাধিকার সীমিত হয়ে পড়ায় এ গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত দাবিগুলোতে আমার পঠিত যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায় একটি যুক্তদল নির্বাচনে জয় লাভ করে দেশের জনগণকে কিছু প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে। এ দলও জনগণকে ২১ দফার মাধ্যমে অনুরূপ কিছু প্রতিশ্রুতি দেয়।

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মধ্যে প্রতিশ্রুতিস্বরূপ যা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সমবায় পদ্ধতি প্রবর্তন করে কৃষি ও কুটির শিল্পের উন্নতি বিধান করা। শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণির পুনর্বাসনের কথাও এতে বলা হয়। এছাড়া ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি বন্ধ করা এবং নিয়মানুযায়ী নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার বিষয়ও ২১ দফায় উল্লেখ করা হয়। উদ্দীপকেও জোট দলটি এমনই কিছু প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তাদের প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে সকল প্রকার দুর্নীতি নির্মূল করা হবে। সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে, কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে। এছাড়া বাস্তুহারাদের পুর্নবাসন এবং নিয়মিত ও অবাধ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতির কথাও বলা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকের এ বিষয়টিতে যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক দেওয়া ২১ দফা প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ এ প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ উদ্দীপকের ও যুক্তফ্রন্টের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাঙালি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা জনগণকে বিক্ষিপ্ত করে তোলে। তারা পূর্ব পাকিস্তানিদের সাথে উপনিবেশসুলভ আচরণ করতে থাকে। এতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় এবং পূর্ববাংলার মানুষের মধ্যে স্বাধিকার আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হয়। শোষণ, বৈষম্য দূর হয়ে যাতে জনগণের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় সে আকাঙ্ক্ষায় তারা ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকে এবং যুক্তফ্রন্টের দেয়া প্রতিশ্রুতির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, এতে অবাধ, নিয়মিত এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়। সকল প্রকার দুর্নীতি নির্মূল করা এবং সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন করে কৃষি ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। এছাড়া শ্রমিক, কারিগর শ্রেণি এবং বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ওয়াদাও করা হয়।

এসব ওয়াদা পূর্ণ হলে জনগণ দীর্ঘদিনের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে পারবে। জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্বাচন হলে তারা ইচ্ছামতো সৎ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক নির্বাচন করতে পারবে। এতে জনগণের আশা- আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপক ও যুক্তফ্রন্টের দেয়া প্রতিশ্রুতি জনগণের অশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম।

প্রশ্ন ▶ ৫ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছয়দফা কর্মসূচির মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখতে বললে 'ক' নামক শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত উত্তরটি লিখে শিক্ষককে জমা দেয়।

১. দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়সমূহের ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। অবশিষ্ট সকল ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

২. পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য নিজস্ব গণবাহিনী বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা থাকবে।

◀ শিখনফল-২

ক. আগরতলা কোথায় অবস্থিত? ১
খ. ছয়দফা দাবি কেন উত্থাপন করা হয়েছিল—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে আলোচিত কর্মসূচির বিষয়বস্তু ছাড়া অন্যান্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। ৩
ঘ. উক্ত কর্মসূচির গুরুত্ব নিরূপণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলা অবস্থিত।

খ পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্ত শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানকে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বঞ্চিত করে ও শোষণ করে। এর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং এর প্রতিবাদস্বরূপ তিনি ১৯৬৬ সালে পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্ত শাসনাধিকার সংবলিত ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন।

গ উদ্দীপকে আলোচিত ছয়দফা কর্মসূচির বিষয়বস্তু ছাড়া অন্যান্য বিষয়বস্তুও রয়েছে।

প্রথমত, পাকিস্তানের দুটি অঞ্চলের জন্য দুটো আলাদা অথচ সহজে বিনিময় যোগ্য মুদ্রা থাকবে। মুদ্রার সহজ হিসাব রাখার জন্য দুটি স্টেট ব্যাংক স্থাপন করতে হবে। মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে দুই অঞ্চলে দুই মুদ্রা থাকবে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে পারবে না। একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক এবং দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

তৃতীয়ত, সকল প্রকার কর ও শুল্ক ধার্য এবং তা আদায়ের ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারে হাতে। আদায়কৃত রাজস্বের নির্ধারিত অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে।

চতুর্থত, দু'অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে প্রদেশগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ব্যাপারে প্রদেশগুলো যুক্তিযুক্তহারে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মেটাবে।

পঞ্চমত, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য নিজস্ব গণবাহিনী বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা থাকবে।

ঘ উক্ত কর্মসূচি অর্থাৎ ছয়দফা কর্মসূচির পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনাধিকার তথা স্বাধীকার আদায়ের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অপরিসীম গুরুত্ব ছিল।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছয়দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। ছয়দফা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, ছয়দফা বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মজুর, মধ্যবিত্ত তথা গোটা বাঙালির মুক্তির সনদ এবং বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত পদক্ষেপ। শোষকের হাত থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হচ্ছে ছয়দফা।

১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনের গুরুত্ব নিম্নরূপ—

প্রথমত, বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ছয়দফা দাবি হলো পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির সনদ।

দ্বিতীয়ত, ছয়দফা দাবির মধ্যদিয়ে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে লালন করে। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালিরা নতুন করে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করে।

তৃতীয়ত, ছয়দফা কর্মসূচি বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এ আন্দোলনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ পাঞ্জাবিদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, ছয়দফা আন্দোলন স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে।

পঞ্চমত, ছয়দফা কর্মসূচি বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বাঙালির মুক্তির সনদ নামে পরিচিত এ আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও শাসন থেকে বাঙালিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ ড. আহমেদ জামাল ক্লাসে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অমানবিক শোষণের বর্ণনা দিতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে দীর্ঘদিন ধরে শাসনের নামে শোষণ করে। ফলে, দু পাকিস্তানের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয় স্বাধিকার আন্দোলন। ১৯৬৬ সালের ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ছয়দফা কর্মসূচি আন্দোলনে আওয়ামী লীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ কর্মসূচিকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়। ◀ শিখনফল: ২

ক. 'বাঙালির ম্যাগনাকার্টা' বলা হয় কোন কর্মসূচিকে? ১
খ. পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সামরিক বৈষম্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ড. আহমেদ জামালের বক্তব্যের আলোকে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে ছয়দফা বাঙালির মুক্তির জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রেরণা দান করে— ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছয়দফা কর্মসূচির ধারাসমূহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলা হয় 'ছয়দফা' কর্মসূচিকে।

খ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক বৈষম্য ছিল পর্বতসম। দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দফতরই স্থাপিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অস্ত্র কারখানাগুলোও স্থাপন করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। এছাড়া সামরিক বাহিনীর চাকরিগুলো ছিল প্রায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য একচেটিয়া। পাকিস্তানের মোট বার্ষিক আয়ের ৭% ও পরে ৬০% ব্যয় হতো প্রতিরক্ষা খাতে। আর এ অর্থের সুবিধাভোগী ছিল সম্পূর্ণ পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ। সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারগণ সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী।

গ ড. আহমেদ জামালের বক্তব্যে ১৯৬৬ সালের বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটেছে। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এ ছয়দফা বাঙালির মুক্তির জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রেরণা দান করে।

ছয়দফা দাবি ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দীর্ঘকাল ধরে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। প্রস্তাবের প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই ছয়দফাকে 'আপামর জনসাধারণের মুক্তির সনদ এবং বাংলায় অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত পদক্ষেপ বলে আখ্যা দিয়েছেন। বাঙালির অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে এটি ছিল ম্যাগনাকার্টা। ছয়দফা দাবির মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পৃথক মুদ্রা চালু ও দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক রাখা এবং আঞ্চলিক মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হওয়ায় আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ছয়দফার প্রভাব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ছয়দফায় সরাসরি স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলা হয়নি সত্য কিন্তু প্রতিটি দাবি বিশ্লেষণ করলে স্বায়ত্তশাসনের যথার্থতা

মিলে। এই দাবি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রাণের দাবি ও বাঙালির মুক্তির সনদ। কিন্তু পাকিস্তানের শাসক শ্রেণি কোনো অবস্থাতেই ছয়দফাভিত্তিক দাবি মানতে রাজি ছিল না। তাই আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে বাঙালিদের ওপর কঠোর দমননীতি অনুসরণ করে। কিন্তু বাঙালি তাতে মাথানত না করে সকলে আরো ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ছয়দফাভিত্তিক আন্দোলন শুরু করে। শেষ পর্যন্ত জেনারেল আইয়ুবের পতন হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে বাঙালির স্বশাসনের বিষয়টি সময়ের ব্যাপারে পরিণত হয়। কিন্তু নির্বাচিত হয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে শুরু হয় পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন যা সশস্ত্র আন্দোলনে রূপ নেয়। নয় মাসের যুদ্ধশেষে বাঙালি লাভ করে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র। এভাবে ছয়দফা বাঙালি জাতিকে মুক্তির প্রেরণা দেয়।

ঘ উদ্দীপকে ড. আহমেদ জামাল তার বক্তব্যে ছয়দফা কর্মসূচির সচিত্র তুলে ধরেছেন। নিম্নে উক্ত কর্মসূচির ধারাগুলো বিশ্লেষণ করা হলো:

১ম দফা: লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে হবে। এটি সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা হবে সার্বভৌম।

২য় দফা: ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় এবং অন্যান্য বিষয় থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

৩য় দফা: দুই দেশের জন্য সহজে বিনিময় যোগ্য দুটি ভিন্ন মুদ্রা চালু থাকবে। মুদ্রা লেনদেনের হিসাব রাখার জন্য দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে। মুদ্রা ও ব্যাংক পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

৪র্থ দফা: সকল প্রকার কর ও শুল্ক ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। আদায়কৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। এ দ্বারা ফেডারেল সরকার ব্যয় নির্বাহ করবে।

৫ম দফা: বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রদেশগুলোর হাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ব্যাপারে প্রদেশগুলো যুক্তিযুক্ত হারে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাবে।

৬ষ্ঠ দফা: আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা জন্য প্রদেশগুলো নিজস্ব মিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ৭ জাপানের হোক্কাইডো অঞ্চলের আমলা, সেনাবাহিনীর কর্তৃক হনসু অঞ্চলের মানুষ যখন শোষিত, বঞ্চিত তখনই হনসু অঞ্চলের নেতা ও হনসুলীগ সভাপতি মি. হিনচি ১৯৭৭ সালে হোক্কাইডোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে হনসু অঞ্চলের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ৯ দফা পেশ করেন। স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব, অর্থব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সেখানে পেশ করা হয়। মূলত ৯ দফাই ছিল হনসু অঞ্চলের স্বাধীনতার প্রথম পদক্ষেপ। ◀*শিখনফল-৩*

ক. বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলা হয় কোন কর্মসূচিকে?

খ. 'উনসত্তরের গণআন্দোলন' কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের 'মি. হিনচি' ইতিহাসে কাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. হনসু অঞ্চলের ৯ দফার মতো ছয় দফা দাবি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ — উক্তিটি ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলা হয় ছয় দফা কর্মসূচিকে।

খ আগরতলা ষড়যন্ত্রমূলক মামলার বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার ছাত্ররা ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে যে আন্দোলণের ডাক দেয় তা অচিরেই গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। ইতিহাসে এ আন্দোলন উনসত্তরের গণআন্দেলান বা গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দানের জন্য বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে। এতে পূর্ব বাংলার ৩৫ জনকে আসামি করা হয়। এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ ১১ দফা ভিত্তিক কর্মসূচি ঘোষণা করে আন্দোলনের ডাক দেন। স্বল্পকালের মধ্যেই এ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আর তরুণ ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এ গণঅভ্যুত্থানের তীব্র গতি লাভ করে। অবশেষে গণঅভ্যুত্থানের মুখে টিকতে না পেরে আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন। এভাবে গণঅভ্যুত্থান সফল রূপ পরিণত করে।

গ উদ্দীপকে 'মি. হিনচি' ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্দেশ করে।

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি প্রদর্শিত বৈষম্যের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট এর নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়ন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তারপর ১৯৬২-১৯৬৫ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ১৯৬৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের এক কনফারেন্সে ৬ দফা দাবি পেশ করেন। এ ছয় দফা দাবির প্রথম দফায় ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশনরূপে গড়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও বাকি দফাগুলোতে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব, অর্থব্যবস্থাপনা, আঞ্চলিক সরকারের কর ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা, বৈদেশিক মুদ্রা, আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক চুক্তি, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। যদিও পশ্চিমা শাসকবর্গ এ দাবি মেনে নেয়নি তথাপি এটি ছিল বাঙালির আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি।

এভাবে বঙ্গবন্ধু ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ উদ্দীপকের আলোচিত বিষয় মূলত ৯ দফাই ছিল হনসু অঞ্চলের স্বাধীনতার প্রথম পদক্ষেপ অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিই ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি। এ ছয় দফায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি শিল্প, কল-কারখানা, ব্যবসা, বাণিজ্য সংস্থা, ব্যাংক, বিমা, আয়-ব্যয় নীতিমালা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক কার্যকরি প্রতিবাদ। আর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় এই ছয় দফা দাবিই ছিল একমাত্র সারথি। ছয় দফা বাণী কর্মীদের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র প্রচারিত হয়। ফলে পাকিস্তান সরকার ভীতসন্ত্রস্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে শেখ মুজিব এবং তাঁর সহকর্মীদের গ্রেফতার করে। অতঃপর ১৯৬৮ সালে কারারুদ্ধ থাকাকালে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার 'আগরতলা মামলা' স্বাক্ষর করেন। এতে শুরু হয় এক গণভিত্তিক আন্দোলন। আর ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হওয়ার পর তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। অবশেষে

পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মুক্তি দেয়। আর এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটে। ফলে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে ১৯৭০ সালে নির্বাচন দানের ঘোষণা করেন। এ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করলে সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতী ছিলেন না। এর প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু এক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। আর দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতার সূর্য।

তাই বলা যায় যে, ছয় দফা দাবিই মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ বপনে অগ্রগন্য ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রশ্ন ▶৮ পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাস শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের ইতিহাস এবং বৈষম্যের ইতিহাস। এ শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের হাত থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে উত্থাপিত হয় ছয় দফা দাবি। এ ছয়দফা দাবি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ছয়দফাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা আন্দোলন এক পর্যায়ে গণ আন্দোলনে রূপ নেয়। এ গণ আন্দোলন, গণ অভ্যুত্থানে রূপ নিলে আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। ◀ *শিখনফল: ২ ও ৪*

ক. কখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়? ১

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথমাংশে যে বিষয়টির আলোকপাত করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষাংশে যে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়।

খ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। আবার প্রাদেশিক পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ২৯৮ টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

গ উদ্দীপকের প্রথমাংশে ১৯৬৬ সালের 'ছয়দফা' দাবি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবি ছয়দফা ঘোষণা করেছিলেন। বাঙালি জাতি ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটায় তারই মূলে সেদিন বারি সিঞ্চন করেছিল ছয়দফা কর্মসূচি। ছয়দফা কর্মসূচি অন্ধকারে নিমজ্জিত বাঙালি জাতিকে সংগ্রামের শক্তি যুগিয়েছিল। প্রেরণা যুগিয়েছিল স্বৈরাচারী ও গণবিরোধী শাসকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। আইয়ুব খান সরকার বাঙালি জাতীয়তাবাদকে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা আন্দোলনকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করার জন্য অত্যাচার-নিপীড়ন চালাচ্ছিলেন। এ কারণে আন্দোলনের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ছয়দফায় বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়। বাঙালির ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা, সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা ও মুদ্রার প্রচলনের কথা বলা হয় এই ছয়দফায়। যা বাঙালির রাজনীতি ও প্রশাসনে এক অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি সাধন করেছিল। এরই পরিণতিতে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন।

তাই বলা যায়, ছয়দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ, বাঙালির ম্যাগনাকার্টা।

ঘ উদ্দীপকের শেষাংশে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের বিষয়টি অবতারণা করা হয়েছে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ফলাফল ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার, রাজবন্দিদের মুক্তি এবং আইয়ুব খানের পতন। কিন্তু এগুলো ছাড়াও এ অভ্যুত্থানের আরো কিছু সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল। যেমন- ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে বীজ বপন করা হয়, তা উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। এ অভ্যুত্থানের ফলে ২১শে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি হিসেবে নির্ধারিত হয়। এছাড়া আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ১৯৭০ সালে নির্বাচন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। এ অভ্যুত্থানের পরবর্তী বড় সাফল্য ছিল ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মহাবিজয়।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে গ্রাম ও শহরের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির মাঝে চেতনার উন্মেষ ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। বাঙালি জাতিয়তাবাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে, যাতে বলীয়ান হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৬৯ -এর গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খানের পতন আগরতলা মামলা প্রত্যাহার হলেও এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

প্রশ্ন ▶৯ ১৯৮৯ সালের ১৪ এপ্রিল চীনের নানকিং অঞ্চলে কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের একটি আন্দোলন হয়। এ আন্দোলনে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে বহু ছাত্র প্রাণ হারায়। আমাদের দেশেও এরূপ একটি আন্দোলন হয়েছিল যা ছাত্রদের মাধ্যমে শুরু হলেও পরে তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. আগরতলা মামলার প্রধান আসামিসহ মোট আসামি কতজন ছিল? ১

খ. ছয়দফার দুইটি দফা উল্লেখ কর। ২

গ. নানকিং অঞ্চলের আন্দোলনের সাথে এদেশের কোন আন্দোলন সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলন কীভাবে গণআন্দোলনে রূপ নিয়েছিল- বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগরতলা মামলার প্রধান আসামিসহ মোট আসামি ছিল ৩৫ জন।

খ ছয়দফার দুইটি দফা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১ম দফা: লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে হবে। এটি সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে।

২য় দফা: ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। অন্যান্য বিষয় থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

গ নানকিং অঞ্চলের আন্দোলনের সাথে এদেশের ১১ দফা আন্দোলন সাদৃশ্যপূর্ণ।

১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দরা মিলে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধুর ছয়দফার সাথে মিলিয়ে আরও কয়েকটি দাবি নিয়ে ১১ দফা দাবি পেশ করে। এ ১১ দফা দাবি

আদায়ের লক্ষে 'ডাক' ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৮ জানুয়ারি পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট পালন করেন। ধর্মঘট চলাকালীন পুলিশের সাথে ছাত্রদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ২০ জানুয়ারি নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্ররা হরতাল পালন করে। হরতাল পালনকালে ছাত্রনেতা আমানুল্লাহ আসাদুজ্জামান আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। আসাদের হত্যার প্রতিবাদে ২২, ২৩ ও ২৪ তারিখে সারা দেশে ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ২৪ তারিখে হরতাল চলাকালে সারা দেশে সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে। এরপর ২৪ জানুয়ারির পর থেকে লাগাতার আন্দোলন ও হরতালে বহুসংখ্যক মানুষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত ও আহত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ১৯৮৯ সালের ১৪ এপ্রিল চীনের নানকিং অঞ্চলে কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে একটি ছাত্র আন্দোলন হয়। এ আন্দোলনে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে বহু ছাত্র প্রাণ হারায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকে উল্লিখিত চীনের ছাত্র আন্দোলনের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৬৯ সালের ছাত্র আন্দোলনের মিল রয়েছে।

ঘ উক্ত আন্দোলন তথা ১৯৬৯ সালের ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের সকল মানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। ফলে ছাত্রদের উক্ত আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯৬৯ সালের ১৮ই জানুয়ারি এগারো দফার দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট পালনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এবং আহত অবস্থায় বন্দি হয়। ২০ জানুয়ারি হাজার হাজার ছাত্র-জনতা পুলিশ এবং ইপিআর-এর সাথে অসম লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। পুলিশ একপর্যায়ে পশ্চাদপসরণ করলেও বিরাট একটি মিছিল শহিদ মিনারের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ আতর্কিত গুলি বর্ষণ করে। সে সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান। ২১-এ জানুয়ারি আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে বহু লোক রাস্তায় নেমে পড়ে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে এক চেতনার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি হিসেবে ছাত্ররা এ আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তা একসময় ছাত্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়ে শহর ও গ্রামের শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের মাঝে। ফলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গড়ে উঠে এক দুর্বার আন্দোলন। যা ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ আফ্রিকায় একটি শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র ছিল। যেখানে ৩০ বছর যাবৎ সামরিক শাসনের মাধ্যমে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছিলেন একজন শাসক। অবশেষে সে দেশের গণআন্দোলনের জোয়ার নামে। সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দেশজুড়ে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিবাদে দেশটিতে গণআন্দোলন শুরু হয় এবং আন্দোলনের মুখে শাসক পদত্যাগে বাধ্য হয়। পাকিস্তান আমলেও এরকমই একজন একনায়কের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন হয়েছিল এবং তিনিও পদত্যাগে বাধ্য হন। ◀ *শিখনফল-৪*

ক. মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারি করেছিলেন কে? ১

খ. পূর্ব বাংলার রক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানে নিহিত— কেন এ কথা বলা হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সাথে পাকিস্তানের কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? তিনি তৎসময়ে কোন উল্লেখযোগ্য কাজটি করেছিলেন? ৩

ঘ. উক্ত ব্যক্তির কাজটি ব্যর্থ হওয়ার কারণ লেখো এবং তিনি কেন পদত্যাগে বাধ্য হন? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারি করেন আইয়ুব খান।

খ পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সামরিক বৈষম্যের কারণে 'পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানে নিহিত' বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক বৈষম্য ছিল পর্বত প্রমাণ। দেশ রক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দফতরই স্থাপিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অস্ত্র কারখানাগুলোও স্থাপন করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। সামরিক বাহিনীর চাকরিগুলো ছিল প্রায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য একচেটিয়া। সামরিক বাহিনী উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ সবাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী। এসব বৈষম্যের কারণে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কেউ কেউ প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্যটি করে।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসকের সাথে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি তৎসময়ে উল্লেখযোগ্য যে কাজটি করেছিলেন তা হলো মৌলিক গণতন্ত্র প্রণয়ন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আফ্রিকার একটি রাষ্ট্রে একজন শাসক ৩০ বছর যাবৎ সামরিক শাসনের মাধ্যমে একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। এ শাসক সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় দেশ ভরিয়ে তোলেন। ফলে সে দেশে তার এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের জোয়ার নামে। পাকিস্তান আমলের শাসক আইয়ুব খানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি পাকিস্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করে এক দশককাল দেশে সামরিক শাসন জারি রেখে একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করেন। তার সময়ে গণতন্ত্রের কবর রচনা, গণবিরোধী অশুভ শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি, সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের অত্যধিক প্রভাব, ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বপাকিস্তানিদের সকল অধিকার আদায়ে অনীহা প্রভৃতি অনাচার প্রকটরূপ ধারণ করে। এ কারণে দেশে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশে মৌলিক গণতন্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। জনগণ যাতে তাদের নিজস্ব বিষয় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে সে সুযোগ সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য বলে দাবি করা হয়।

ঘ উক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ আইয়ুব খানের উক্ত কাজটি অর্থাৎ মৌলিক গণতন্ত্র প্রণয়ন প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক না হওয়ার কারণে এ কাজটি ব্যর্থ হয় এবং গণআন্দোলনের মুখে তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন।

জনগণ যাতে তাদের নিজস্ব বিষয় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে, সে সুযোগ সৃষ্টি করাই মৌলিক গণতন্ত্রের লক্ষ্য বলে দাবি করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জনগণের সরাসরি অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না। তাই এ ব্যাপারে জনগণের সমর্থন না থাকায় এ কাজটি ব্যর্থ হয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই স্বৈরাচারী শাসকচক্র জনগণের শোষণ, অত্যাচার এবং নির্যাতন চালায়। এর প্রতিবাদে বাংলার নিপীড়িত জনগণের আর একটি তেজোদীপ্ত প্রতিবাদ ১৯৬৮ সালের গণঅভ্যুত্থান। আওয়ামী লীগের ছয় দফা আন্দোলন পূর্ব বাংলায় জনপ্রিয়তা অর্জন করার সাথে সাথে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার ভীত হয়ে পড়ে। আইয়ুব-মোনায়েমচক্র আওয়ামী লীগের এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য প্রদেশব্যাপী আওয়ামীলীগ কর্মীদের পাইকারিভাবে গ্রেফতার করেন।

এরপর শুরু হয় তাদের ওপর জেল, জুলুম ও অত্যাচার। তখন পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার ওপর ও শুরু হয় সরকারের নির্যাতন ও নিপীড়ন।

স্বৈরাচারী সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের দমননীতির বিরুদ্ধে পূর্বে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের তীব্র বিক্ষোভ সমগ্র দেশে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। তখন মওলানা ভাসানী সারাদেশব্যাপী ৬ ডিসেম্বর 'প্রতিরোধ' দিবস পালনের আহ্বান জানান। তিনি পুলিশের প্রতিবন্ধকতা এবং লাঠিচার্জ উপেক্ষা করে গভর্নর হাউস ঘেরাও করেন। এরপর স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের মুখে জেনারেল ইয়াহিয়ার অনুকূলে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

প্রশ্ন ▶ ১১ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী মিমি ও সিমি তাদের ইতিহাসের শিক্ষকের কাছ থেকে জেনেছে, ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে তালবাহানা শুরু করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে বাঙালিরা মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. বাঙালি জাতির মুক্তির প্রধান সনদ কাকে বলা হয়? ১

খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচনে অংশ নেয়া প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও তাদের প্রাপ্ত আসনের একটি বিবরণ দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন কি বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬ দফা দাবিকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

খ ১৯৬৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেক মুজিবুর রহমান সহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে যে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা করে তাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের দমন-পীড়ন সহ্য না করতে পেরে বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বিপ্লবের চিন্তা করেন এবং একপর্যায়ে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় গিয়ে কংগ্রেস নেতা ও ত্রিপুরার মূখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সাথে মিলিত হয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু শীঘ্রই এ ঘটনা গোয়েন্দা সংস্থার কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার যে মামলা করে তাই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

গ শিক্ষকের কাছ থেকে মিমি ও সিমি ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচন সম্পর্কে জানতে পেরেছে।

বাঙালি জাতির কাছে ১৯৭০ সালে নির্বাচন একই মাইফলক। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে মোট ১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামীলীগ পায়- ১৬৭টি, পিপলস পার্টি পায়- ৮৮টি, মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)-৯টি, মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)- ৭টি আসন। এছাড়া মুসলিম লীগ কনভেনশন-২টি, ন্যাপ ওয়ামী- ৬টি, জামায়াতে-ই ইসলামী- ৪টি, জামাত-ই-উলেমা পাকিস্তান-৭টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পায়- ৭টি আসন। ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে, আওয়ামীলীগ- ২৮৮ টা, পিডিপি- ২টি, ন্যাপ ওয়ালী- ১টি, জামায়াত-ই ইসলামী- ১টি, নেজামে ইসলাম- ১টি, স্বতন্ত্র- ৭টি। মোট আসন ছিলো ৩১০ টি, ১০টি ছিলো সংরক্ষিত মহিলা আসন।

উদ্দীপকে মিমি ও সিমি তাদের ইতিহাসের শিক্ষকের কাছ থেকে ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনের কথা শুনেছিলো। যেখানে, জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্বপাকিস্তান মোট ১৬২ ও পশ্চিম পাকিস্তান মোট ৩১টি আসন লাভ করে। আর প্রাদেশিক নির্বাচনেও আওয়ামীলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের নির্বাচনটি ১৯৭০ সালেরই ঐতিহাসিক নির্বাচন।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে নির্দেশকৃত ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাঙালী জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করে।

১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে আওয়ামীলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পশ্চিম পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে চাইনি বরং টালবাহানা করতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খানকে ১৫ ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের দিন ধার্য করতে বলেন। কিন্তু তিনি কোনো কারণ ছাড়াই ৩ মার্চ অধিবেশনের দিন ধার্য করে। ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান একটি ঘোষণার মাধ্যমে জাতীয় অধিবেশনের দিন অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে দেন। পাকিস্তানি শাসকচক্রের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র কে নস্যাৎ করতে বাঙালীরা আরেকটি আন্দোলনে অংশ নিতে বাধ্য হয়। শুরু হয় বাঙালীর অসহোযোগ আন্দোলন। ২ ও ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। তার কয়েক দিন পরেই তিনি তার সেই ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ দেন। ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালী জাতিকে আরো বেশি যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করে। এর মধ্যে ১৫ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও ভূট্টো-ইয়াহিয়ার মধ্যে প্রহসনের আলোচনা চলে এবং ২৫ মার্চ রাতে পাক বাহিনী বাঙালীদের উপর যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে ও শেখ মুজিবকে বন্দী করে।

উদ্দীপকে নির্দেশিত ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পশ্চিম পাকিস্তান শাসকরা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা করে। ফলে নির্যাতীত বাঙালিরা স্বাধিকারের জন্য অনুপ্রাণিত হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়।

তাই এ কথা বলা যায় যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিলো বঙালীদের জন্য অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ও অনুপ্রেরণাদায়ক নির্বাচন। যেটি তাদেরকে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশনিতে অনুপ্রাণিত করে।

প্রশ্ন ▶ ১২ ৭ই এপ্রিল ২০১৪ থেকে ভারতের লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এসি নিয়েলসনের সহায়তায় এবিপি নিউজের এক জরিপের ফলাফলে বলা হয় বিজেপি ও এনডিএ এবার অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। নির্বাচনের মূল আকর্ষণ নরেন্দ্রমোদি ও সোনিয়া গান্ধী। পাকিস্তানী আমলের শেষের দিকে এদেশের একটি নির্বাচনের মূল আকর্ষণ ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভূট্টো। তারা উভয়েই চমৎকার বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ◀ *শিখনফল-৫*

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি কয়টি আসন পেয়েছিল? ১

খ. মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তোমার পঠিত নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য মূল্যায়ন করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি ১টি আসন পেয়েছিল।

খ মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকার সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের মোট ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন-সহযোগিতা ও জনমত সংগঠনের উদ্দেশ্যে এই সরকার বহির্বিশ্বে সফল কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়।

গ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আমার পঠিত নির্বাচন হলো ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন।

১৯৬৯ সালের প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সেনাপ্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসেই দেশে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। তবে ২৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে তিনি অনতিকালের মধ্যে দেশে একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠন এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দেন। জেনারেল ইয়াহিয়ার ২৬ মার্চ ভাষণ সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনে হলেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এতে সংশয় প্রকাশ করেন। তারা অবিলম্বে নির্বাচনের দাবি জানান। অবশেষে ক্ষমতা গ্রহণের ৮ মাস পর ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই ঘোষণায় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এক ইউনিট প্রথা বাতিল করে ইতঃপূর্বে অবলুপ্ত ৪টি প্রদেশ পুনর্বহাল করেন।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল সার্বজনীন বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের অনুষ্ঠিত প্রথম স্বাধীন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এ নির্বাচনের ফলাফল ছিল যেমন চমকপ্রদ, তেমনি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রেও এ নির্বাচনের প্রভাব ছিল তাৎপর্যমন্ডিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের অপরিসীম ভূমিকা ও প্রভাব ছিল। এ নির্বাচনকে পাকিস্তানের পতন ঘন্টা এবং স্বাধীন বালাদেশের অভ্যুদয়ের বার্তাবাহক হিসেবে গণ্য করা হয়। বস্তুত এ নির্বাচনের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ব পাকিস্তান শাসনের বৈধতা হারায়।

১৯৪৭ সালের পর থেকে বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবাদ দাবি করে আসছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান নানা উপায়ে তাদেরকে দমিয়ে রেখেছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির সে স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয় ঘটে। অপরপক্ষে এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি লাভ করে। এ অবস্থায় পশ্চিমা শাসকরা নির্বাচনী বিজয়কে নস্যাতের চক্রান্ত শুরু করলে বাঙালি জাতি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসে নিজেদের স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

তাই বলা যায় যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বীজ নিহিত ছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৩ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে মি. তারেক বিপুল ভোটে জয়ী হয়। এই জনসমর্থন দেখে শওকত সাহেব নানা মন্তব্য করলেন, একটি জাতীয় নির্বাচনে একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেও ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় সরকার গঠন করতে পারেনি। তবে এ নির্বাচন আমাদের দেশের স্বাধীনতার বিজয় ছিনিয়ে আনার অনুপ্রেরণা দেয়। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. কত সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন হয়? ১

খ. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রশাসনিক বৈষম্য বর্ণনা কর। ২

গ. শওকত সাহেব অতীতের যে নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেছেন তা কোন নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত নির্বাচন বাঙালিকে কীভাবে স্বাধীনতার বিজয় অর্জনের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

খ ১৯৪৭ সালে করাচিতে রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় সকল সরকারি অফিস আদালতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ব্যাপকহারে চাকরি লাভ করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হয়েছে। পাকিস্তান আমলে দুই অঞ্চলের প্রশাসনিক বৈষম্যও ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২০০০ কর্মকর্তার ২৯০০ জন কর্মকর্তা বাঙালি ছিলেন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানে যে মন্ত্রণালয় গঠিত হয় তার বেশিরভাগ শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাগণ পশ্চিম পাকিস্তানের ছিলেন।

গ শওকত সাহেব অতীতের যে নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেছেন তা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে মি. তারেকের অনুরূপ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় সরকার গঠন করতে পারেনি। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন এবং ৭টি সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আবার পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এ নির্বাচনে জয়লাভ করায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়া ছিল ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শওকত সাহেব ১৯৭০ সালের নির্বাচনের স্মৃতিচারণ করেছেন।

ঘ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানার সূত্র ধরেই বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৭০-এর বিজয়ে বলীয়ান হয়েই বাঙালির মনে আত্মপ্রত্যয় জন্মে যে, তারা দেশ জয়ের সংগ্রামে বিজয়ী হবে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি লাভ করে এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৭১ সালে পূর্ণতা প্রাপ্ত এ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তাছাড়া ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়কে বাঙালি জনগণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় বলে উল্লসিত হয় এবং আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠে। এ নির্বাচন বাঙালি জনগণকে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির চেতনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়— যা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চেতনা হিসেবে কাজ করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের এবং পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। দুটি দলই অঞ্চলভিত্তিক দলে পরিণত হয় এবং নিজেদের কর্মসূচি ও দাবি-দাওয়ার প্রতি অনড়

থাকে। যা পাকিস্তানের ভাঙনকে ত্বরান্বিত করে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রাকে সহজ করে দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর দুঃশাসন ও শোষণের হাত হতে বাঙালি জাতির স্বাধিকার ও মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষারই বহিঃপ্রকাশ।

প্রশ্ন ▶ ১৪ পারস্য সম্রাট নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন ১৭৩৮ সালে। মুঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহ পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। নাদির শাহ দিল্লিতে প্রবেশ করেন। দিল্লির অধিবাসীরা নাদির শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় তার সেনাদল বহু সংখ্যক দিল্লিবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। নারীদের ওপর চালানো হয় পাশবিক নির্যাতন।

◀ *শিখনফল: ৭*

ক. কে প্রথম পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন? ১

খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কী? ২

গ. নাদির শাহের নৃশংস কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পাক-বাহিনীর কোন কর্মকাণ্ডের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত কর্মকাণ্ডের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল? ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন।

খ ১৯৬৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে যে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা করে তাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের দমন-পীড়ন সহ্য করতে না পেরে বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বিপ্লবের চিন্তা করেন এবং একপর্যায়ে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় গিয়ে কংগ্রেস নেতা ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সাথে মিলিত হয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু শীঘ্রই এ ঘটনা গোয়েন্দা সংস্থার কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার মামলা করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

গ নাদির শাহের নৃশংস কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পাক-বাহিনীর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যার মিল রয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়। সে সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনগণের ওপর হামলা করে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৫ মার্চ এ অভিযান পরিচালনা করলেও মূলত মার্চের প্রথম থেকেই তারা এর পরিকল্পনা করে। সব প্রস্তুতি শেষে ২৫ শে মার্চকেই বেছে নেওয়া হয়। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ঢাকা শহরের মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়। গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আক্রমণ শুরু হয় তার নেতৃত্বে। ২৫ মার্চ রাতে একইভাবে তারা পুরনো ঢাকা, কচুক্ষেত, কলাবাগান, মিরপুর প্রভৃতি স্থানে গণহত্যা চালায়। এছাড়া তারা ঢাকার পাশাপাশি দেশের অন্যান্য জায়গায় গণহত্যা শুরু করে। ঐ রাতেই পাকিস্তানি সেনারা বহু বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করে। তাদের এ বাঙালি নির্বযন অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দিল্লির অধিবাসীরা নাদির শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় তার সেনাদল বহু সংখ্যক দিল্লিবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সুতরাং বলা যায়, নাদির শাহের উক্ত কর্মকাণ্ডের সাথে পাক-হানাদার বাহিনীর ২৫ মার্চ রাতের গণহত্যার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উক্ত কর্মকাণ্ডের তথা ২৫ মার্চ রাতের গণহত্যার শেষ পরিণতি হিসেবে বাঙালি জাতি দীর্ঘ ২৪ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে স্বাধীন হয়।

২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যা শুরু হলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তা ওয়্যারলেস যোগে পাঠিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা শোনামাত্রই চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। শুরু হয় পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে বাঙালি পুলিশ, আনসার ও সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত। বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

বাংলাদেশ হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে প্রথম দেশ, যে দেশ সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পূর্ব বাংলার জনগণ সর্বপ্রকার অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য, জাতি নিপীড়নের শিকার হয়েছে। কিন্তু এ ভূ-খণ্ডের সংগ্রামী মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুঁখে দাড়ায়। দীর্ঘ নয়মাস ১৯৭১ সালের ১৬ মহান মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে এর সফল পরিসমাপ্তি ঘটে।

সুতরাং বলা যায়, উক্ত কর্মকাণ্ড অর্থাৎ ২৫ মার্চ রাত বাঙালি জাতির জন্য এক বেদনাবিধুর রাত হলেও এর শেষ পরিণতিতে স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন পূরণ হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৫ ১৯৭১-এর মার্চ মাসের সময়টা ছিল ভয়ঙ্কর। তারপরও সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে পাকিস্তান রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের কয়েকজন দুঃসাহসী কর্মকর্তা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঐতিহাসিক একটি ভাষণ সম্প্রচার করেছিলেন। অগ্নিঝরা সেই ভাষণের বিষয়বস্তু পৌঁছে গিয়েছিলো বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে। এ ভাষণের মধ্য দিয়েই বাঙালির নেতা পাকিস্তান সরকারের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেন। এ ভাষণে বাঙালির স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষাকে আরও উস্কে দিয়েছিল। আগুন ধরিয়েছিল জনগণের মনে। ◀ *শিখনফল-৭*

ক. ৭০-এর নির্বাচনে পিপিপি প্রধান কে ছিলেন? ১

খ. পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানিদের অবস্থা আলোচনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ঐতিহাসিক ভাষণের কথা বলা হয়েছে? উক্ত ভাষণের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৭০-এর নির্বাচনে পিপিপি প্রধান ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো।

খ পাকিস্তানিরা কাশ্মীর সীমান্তের ছামর সেক্টরে সাফল্য লাভ করলেও অন্যত্র পরাজিত হতে থাকে।

৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান বাহিনী কাশ্মীরের ভারতীয় অংশ আক্রমণ করলে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের প্রথম থেকেই ভারতীয় বাহিনী প্রাধান্য বজায় রাখতে শুরু করে। ভারতীয় সৈন্যরা আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে লাহোর শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বাঙালি সৈন্যরা ভারতের এ আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়ে শৌর্যবীর্যের এক ইতিহাস সৃষ্টি করে। ১৭ দিন ব্যাপি যুদ্ধ চলার পর জাতিসংঘের নির্দেশে যুদ্ধ বিরতি হয়।

গ উদ্দীপকে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের কথা বলা হয়েছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে পাকিস্তানের সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থানে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। দেশব্যাপী নানারকম উদ্বেগ,

উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের মূল বিষয় ছিল চারটি। প্রথমত, চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার করা। দ্বিতীয়ত, সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া। তৃতীয়ত, গণহত্যার তদন্ত করা। চতুর্থত, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। ইতোপূর্বে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক আলোচনার জন্য ১০ মার্চ ঢাকায় বৈঠক অনুষ্ঠানের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা প্রত্যাখ্যান করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ শর্তগুলো আরোপ করেন।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ্য করি পাকিস্তান রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের কয়েকজন দুঃসাহসী কর্মকর্তা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঐতিহাসিক একটি ভাষণ সম্প্রচার করেছিলেন। অগ্নিঝরা সেই ভাষণের বিষয়বস্তু পৌঁছে গিয়েছিল বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে। এই ভাষণের সাথে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের কথা বলা হয়েছে। এই ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। এ ভাষণ সারাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তাদের উদ্বুদ্ধ করে ঐক্যবদ্ধ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে দেশের জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তার নির্দেশ অনুসারে দেশের স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তান বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ১৩ মার্চ সরকার সামরিক আইন জারি করেন। ১৪ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো একটি অবাস্তব প্রস্তাবের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ফর্মুলা দেন। আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনসাধারনকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন। এরপর ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক শুরু হয়। কিন্তু বৈঠক অসমাপ্ত রেখে ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করার আগে গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে যান। যার ফলে ২৫ মার্চ মধ্য রাতে বাঙালির ওপর নেমে আসে চরম আঘাত। এভাবে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। অর্জন করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক একটি ভূ-খণ্ড।

তাই বলা যায় যে, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক নির্দেশনা।

প্রশ্ন ▶১৬ আজ বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য দিন। ৭১-এর এই দিনে রেসকোর্স ময়দানে এক অসাধারণ কবিতার সৃষ্টি হয়েছিল যে কবিতা শোনার জন্য কারখানা থেকে এসেছিল লোহার শ্রমিক, লাঙল জোয়াল কাঁধে নিয়ে এসেছিল কৃষক, এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক, নারী, বৃদ্ধ, ভবঘুরে, পাতা কুড়ানিরা দলবেঁধে। অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', এই কবিতার পটভূমি, গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। দেশপ্রেমী বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিল। ◀*শিখনফল-৭*

ক. পাকিস্তানি শাসনামলে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর কোথায় ছিল?১

খ. শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়টি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল? পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়টি দেশপ্রেমী বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিল— এ বক্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো।৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানি শাসনামলে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।

খ পশ্চিম পাকিস্তান পরিকল্পিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোনো বরাদ্দ করা হয়নি। ১৯৫৫-১৯৬৭ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ২০৮৪ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭৯৭ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়।

গ উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

যখন ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল তখন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণে তিনি চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলেন। এছাড়াও এ ভাষণে তিনি গণহত্যার তদন্ত করা এবং নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা বলেন। এ ভাষণে তিনি কৌশলে প্রত্যক্ষভাবে ঘোষণা না করে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।" তিনি আরও বলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।" তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান, "ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।"

উদ্দীপকে বলা হয় আজ বাংলাদেশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য দিন। এতে বলা হয় একটি কবিতার কথা এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই ঐতিহাসিক কবিতার সাথে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের সামঞ্জস্য বিদ্যামান।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত বিষয় অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা বলা হয়েছে, যা দেশপ্রেমী বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিল।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। এ ভাষণ সারাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। তার নির্দেশে সকল অফিস আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকায় ১৩ মার্চ সরকার দ্বিতীয় বারের মতো সামরিক আইন জারি করে। ১৪ মার্চ পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এক অবাস্তব প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার ফর্মুলা দিলে বঙ্গবন্ধু তা প্রত্যাখ্যান করে ৩৫ দফা দাবি জারি করেন এবং জনগণকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ইয়াহিয়া খান প্রহসনমূলক আলোচনার জন্য ঢাকা এসে ঢাকা ত্যাগ করার আগে সামরিক বাহিনীকে বাঙালির ওপর আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। শুরু হয় বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করে তারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করে।

পরিশেষে বলা যায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন ▶১ এরফান ও ইনজাম বর্তমানে পাশাপাশি দু'দেশের নাগরিক হলেও এক সময় দুটি দেশ একই দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পৃথক দেশ হওয়ার পর একটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে তারা প্রায় ৭ দিনব্যাপী যুদ্ধ পরিচালনা করে। উদ্দেশ্য অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয়া। ইনজামের দেশের পূর্বাঞ্চল এই যুদ্ধের সময় সম্পূর্ণরূপে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছিল। ◀*শিখনফল-১*

ক. কত সালে তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? ১

খ. ১১ দফা দাবির তিনটি দাবি আলোচনা কর। ২

গ. এরফান ও ইনজামের দেশে যে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. ইনজামের দেশের পূর্বাঞ্চলের মতো পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানও অরক্ষিত অবস্থায় পড়েছিল—মূল্যায়ন কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

খ ১১ দফা দাবি ঘোষণা করা হয় ১৯৬৯ সালে।

১১ দফার তিনটি দাবি হলো: ব্যাংক, বীমা ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ, শিল্প-শ্রমিকদের অধিক মজুরি প্রদান, জরুরি অবস্থার নামে নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য দমনমূলক আইন বাতিল করা।

গ উদ্দীপকে এরফান ও ইনজামের দেশে যে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে তা মূলত পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপটের প্রতিচ্ছবি।

১৯৪৮ সালের প্রথম পাক-ভারত যুদ্ধে কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশ (জম্মু ও কাশ্মীর) ভারতের নিয়ন্ত্রণ ও এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে আসে। এর পর থেকেই সমগ্র কাশ্মীরের ওপর দখল দারিত্ব প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে এ দুটি দেশ নানা প্রচেষ্টা চালায়। ফলশ্রুতিতে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভুট্টোর পরিকল্পনা মোতাবেক কাশ্মীরে সশস্ত্র গেরিলা অনুপ্রবেশ ঘটনা শুরু হয় ১৯৬৫ সালে জুলাই মাসের শেষ দিকে। ব্যাপক গুলি, অগ্নিসংযোগ এবং বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজ চলতে থাকলে পাকিস্তানি প্রচারযন্ত্রে একে ভারতীয় শাসনের বিরুদ্ধে কাশ্মীর বিদ্রোহ বলে চলতে থাকে এবং ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান বাহিনী কাশ্মীরের ভারতীয় অংশে আক্রমণ করলে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। এর কয়েক মাস পর ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিনের মধ্যস্থতায় ভারত-পাকিস্তানে চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান ঘটে।

ঘ ইনজামের দেশের পূর্বাঞ্চলের মতো অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান পাক-ভারত যুদ্ধে অরক্ষিত অবস্থায় পড়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান বলতে বর্তমান বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছে, যা ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান ও ভারতের যুদ্ধকালীন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে এক নতুনমাত্রা যোগ হয়। এর কারণ যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছিল। এ অঞ্চলে প্রতিরক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর ন্যূনতম অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিল না। ভারত ইচ্ছা করলে যেকোনো মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিতে পারত। পূর্ব পাকিস্তানি জওয়ানরা জীবনবাজি রেখে পাঞ্জাবের লাহোর শহর রক্ষা করলেও পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ন্যূনতম নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। এমনকি যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানসহ গোটা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। এছাড়া যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অনেক বেড়ে যায়। যুদ্ধ চলাকালে কেবল সামরিক অসহায়ত্বই প্রমাণিত হয়নি, তখন বহুবিধ অর্থনৈতিক অসুবিধাও বাঙালিরা অনুভব করে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান অনগ্রসর এবং পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল হওয়ায়, যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পূর্বপাকিস্তানিদের দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে কেবল সামরিক দিক নয়, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকেও পূর্ব পাকিস্তানের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।

প্রশ্ন ▶২ উত্তর আমেরিকার একটি দেশে ৪টি দল মিলে একটি জোট গঠন করে এবং নির্বাচনে জয়লাভ করে। জোটটি নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে। তারা দেশের জনগণকে কিছু প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। যার মধ্যে রয়েছে সকল প্রকার দুর্নীতি নির্মূল করা হবে, সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে, কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে, বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন করা হবে, নিয়মিত ও অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। ◀*শিখনফল-২*

ক. কত সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দাবিগুলোর সাথে তোমার পঠিত কোন বিষয়ের দাবির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'এ প্রতিশ্রুতি বাঙালি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটতে সক্ষম'— বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়।

খ ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রণীত গণতন্ত্রকে মৌলিক গণতন্ত্র বলা হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে চল্লিশ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে চল্লিশ হাজার প্রতিনিধি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে

পারেন। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের রাষ্ট্রপতি, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। এতে জনগণের ভোটাধিকার সীমিত হয়ে পড়ায় এ গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত দাবিগুলোতে আমার পঠিত যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায় একটি যুক্তদল নির্বাচনে জয় লাভ করে দেশের জনগণকে কিছু প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে। এ দলও জনগণকে ২১ দফার মাধ্যমে অনুরূপ কিছু প্রতিশ্রুতি দেয়।

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মধ্যে প্রতিশ্রুতিস্বরূপ যা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সমবায় পদ্ধতি প্রবর্তন করে কৃষি ও কুটির শিল্পের উন্নতি বিধান করা। শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণির পুনর্বাসনের কথাও এতে বলা হয়। এছাড়া ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি বন্ধ করা এবং নিয়মানুযায়ী নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার বিষয়ও ২১ দফায় উল্লেখ করা হয়। উদ্দীপকেও জোট দলটি এমনই কিছু প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তাদের প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে সকল প্রকার দুর্নীতি নির্মূল করা হবে। সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে, কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে। এছাড়া বাস্তুহারাদের পুর্নবাসন এবং নিয়মিত ও অবাধ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতির কথাও বলা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকের এ বিষয়টিতে যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক দেওয়া ২১ দফা প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ এ প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ উদ্দীপকের ও যুক্তফ্রন্টের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাঙালি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা জনগণকে বিক্ষিপ্ত করে তোলে। তারা পূর্ব পাকিস্তানিদের সাথে উপনিবেশসুলভ আচরণ করতে থাকে। এতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় এবং পূর্ববাংলার মানুষের মধ্যে স্বাধিকার আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হয়। শোষণ, বৈষম্য দূর হয়ে যাতে জনগণের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় সে আকাঙ্ক্ষায় তারা ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকে এবং যুক্তফ্রন্টের দেয়া প্রতিশ্রুতির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, এতে অবাধ, নিয়মিত এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়। সকল প্রকার দুর্নীতি নির্মূল করা এবং সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন করে কৃষি ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। এছাড়া শ্রমিক, কারিগর শ্রেণি এবং বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ওয়াদাও করা হয়।

এসব ওয়াদা পূর্ণ হলে জনগণ দীর্ঘদিনের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে পারবে। জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্বাচন হলে তারা ইচ্ছামতো সৎ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক নির্বাচন করতে পারবে। এতে জনগণের আশা- আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপক ও যুক্তফ্রন্টের দেয়া প্রতিশ্রুতি জনগণের অশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম।

প্রশ্ন ▶৩ পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাস শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের ইতিহাস এবং বৈষম্যের ইতিহাস। এ শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের হাত থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে উত্থাপিত হয় ছয় দফা দাবি। এ ছয়দফা দাবি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ছয়দফাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা আন্দোলন এক পর্যায়ে গণ আন্দোলনে রূপ নেয়। এ গণ আন্দোলন, গণ অভ্যুত্থানে রূপ নিলে আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। *◀শিখনফল: ২ ও ৪*

ক. কখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়? ১

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথমাংশে যে বিষয়টির আলোকপাত করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষাংশে যে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়।

খ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। আবার প্রাদেশিক পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ২৯৮ টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

গ উদ্দীপকের প্রথমাংশে ১৯৬৬ সালের 'ছয়দফা' দাবি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবি ছয়দফা ঘোষণা করেছিলেন। বাঙালি জাতি ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটায় তারই মূলে সেদিন বারি সিঞ্চন করেছিল ছয়দফা কর্মসূচি। ছয়দফা কর্মসূচি অন্ধকারে নিমজ্জিত বাঙালি জাতিকে সংগ্রামের শক্তি যুগিয়েছিল। প্রেরণা যুগিয়েছিল স্বৈরাচারী ও গণবিরোধী শাসকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। আইয়ুব খান সরকার বাঙালি জাতীয়তাবাদকে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা আন্দোলনকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করার জন্য অত্যাচার-নিপীড়ন চালাচ্ছিলেন। এ কারণে আন্দোলনের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ছয়দফায় বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়। বাঙালির ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা, সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা ও মুদ্রার প্রচলনের কথা বলা হয় এই ছয়দফায়। যা বাঙালির রাজনীতি ও প্রশাসনে এক অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি সাধন করেছিল। এরই পরিণতিতে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন।

তাই বলা যায়, ছয়দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ, বাঙালির ম্যাগনাকার্টা।

ঘ উদ্দীপকের শেষাংশে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের বিষয়টি অবতারণা করা হয়েছে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ফলাফল ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার, রাজবন্দিদের মুক্তি এবং আইয়ুব খানের পতন। কিন্তু এগুলো ছাড়াও এ অভ্যুত্থানের আরো কিছু সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল। যেমন- ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে বীজ বপন করা হয়, তা উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। এ অভ্যুত্থানের ফলে ২১শে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি হিসেবে নির্ধারিত হয়। এছাড়া আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ১৯৭০ সালে নির্বাচন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। এ অভ্যুত্থানের পরবর্তী বড় সাফল্য ছিল ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মহাবিজয়।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে গ্রাম ও শহরের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির মাঝে চেতনার উন্মেষ ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। বাঙালি জাতিয়তাবাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে, যাতে বলীয়ান হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৬৯ -এর গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খানের পতন আগরতলা মামলা প্রত্যাহার হলেও এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

প্রশ্ন ▶ ৪ ১৯৮৯ সালের ১৪ এপ্রিল চীনের নানকিং অঞ্চলে কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের একটি আন্দোলন হয়। এ আন্দোলনে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে বহু ছাত্র প্রাণ হারায়। আমাদের দেশেও এরূপ একটি আন্দোলন হয়েছিল যা ছাত্রদের মাধ্যমে শুরু হলেও পরে তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. আগরতলা মামলার প্রধান আসামিসহ মোট আসামি কতজন ছিল? ১

খ. ছয়দফার দুইটি দফা উল্লেখ কর। ২

গ. নানকিং অঞ্চলের আন্দোলনের সাথে এদেশের কোন আন্দোলন সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলন কীভাবে গণআন্দোলনে রূপ নিয়েছিল- বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগরতলা মামলার প্রধান আসামিসহ মোট আসামি ছিল ৩৫ জন।

খ ছয়দফার দুইটি দফা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১ম দফা: লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে হবে। এটি সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে।

২য় দফা: ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। অন্যান্য বিষয় থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

গ নানকিং অঞ্চলের আন্দোলনের সাথে এদেশের ১১ দফা আন্দোলন সাদৃশ্যপূর্ণ।

১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দরা মিলে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধুর ছয়দফার সাথে মিলিয়ে আরও কয়েকটি দাবি নিয়ে ১১ দফা দাবি পেশ করে। এ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষে 'ডাক' ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৮ জানুয়ারি পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট পালন করেন। ধর্মঘট চলাকালীন পুলিশের সাথে ছাত্রদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ২০ জানুয়ারি নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্ররা হরতাল পালন করে। হরতাল পালনকালে ছাত্রনেতা আমানুল্লাহ আসাদুজ্জামান আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। আসাদের হত্যার প্রতিবাদে ২২, ২৩ ও ২৪ তারিখে সারা দেশে ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ২৪ তারিখে হরতাল চলাকালে সারা দেশে সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে। এরপর ২৪ জানুয়ারির পর থেকে লাগাতার আন্দোলন ও হরতালে বহুসংখ্যক মানুষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত ও আহত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ১৯৮৯ সালের ১৪ এপ্রিল চীনের নানকিং অঞ্চলে কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে একটি ছাত্র আন্দোলন হয়। এ আন্দোলনে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে বহু ছাত্র প্রাণ হারায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকে উল্লিখিত চীনের ছাত্র আন্দোলনের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৬৯ সালের ছাত্র আন্দোলনের মিল রয়েছে।

ঘ উক্ত আন্দোলন তথা ১৯৬৯ সালের ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের সকল মানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। ফলে ছাত্রদের উক্ত আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯৬৯ সালের ১৮ই জানুয়ারি এগারো দফার দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট পালনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এবং আহত অবস্থায় বন্দি হয়। ২০ জানুয়ারি হাজার হাজার ছাত্র-জনতা পুলিশ এবং ইপিআর-এর সাথে অসম লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। পুলিশ একপর্যায়ে পশ্চাদপসরণ করলেও বিরাট একটি মিছিল শহিদ মিনারের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ আতর্কিত গুলি বর্ষণ করে। সে সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান। ২১-এ জানুয়ারি আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে বহু লোক রাস্তায় নেমে পড়ে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে এক চেতনার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি হিসেবে ছাত্ররা এ আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তা একসময় ছাত্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়ে শহর ও গ্রামের শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের মাঝে। ফলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গড়ে উঠে এক দুর্বার আন্দোলন। যা ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

প্রশ্ন ▶ ৫ আফ্রিকায় একটি শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র ছিল। যেখানে ৩০ বছর যাবৎ সামরিক শাসনের মাধ্যমে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছিলেন একজন শাসক। অবশেষে সে দেশের গণআন্দোলনের জোয়ার নামে। সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দেশজুড়ে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিবাদে দেশটিতে গণআন্দোলন শুরু হয় এবং আন্দোলনের মুখে শাসক পদত্যাগে বাধ্য হয়। পাকিস্তান আমলেও এরকমই একজন একনায়কের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন হয়েছিল এবং তিনিও পদত্যাগে বাধ্য হন। ◀ *শিখনফল-৪*

ক. মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারি করেছিলেন কে? ১
খ. পূর্ব বাংলার রক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানে নিহিত— কেন এ কথা বলা হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সাথে পাকিস্তানের কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? তিনি তৎসময়ে কোন উল্লেখযোগ্য কাজটি করেছিলেন? ৩
ঘ. উক্ত ব্যক্তির কাজটি ব্যর্থ হওয়ার কারণ লেখো এবং তিনি কেন পদত্যাগে বাধ্য হন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারি করেন আইয়ুব খান।

খ পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সামরিক বৈষম্যের কারণে 'পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানে নিহিত' বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক বৈষম্য ছিল পর্বত প্রমাণ। দেশ রক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দফতরই স্থাপিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অস্ত্র কারখানাগুলোও স্থাপন করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। সামরিক বাহিনীর চাকরিগুলো ছিল প্রায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য একচেটিয়া। সামরিক বাহিনী উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ সবাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী। এসব বৈষম্যের কারণে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কেউ কেউ প্রশ্নে উল্লিত মন্তব্যটি করে।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসকের সাথে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি তৎসময়ে উল্লেখযোগ্য যে কাজটি করেছিলেন তা হলো মৌলিক গণতন্ত্র প্রণয়ন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আফ্রিকার একটি রাষ্ট্রে একজন শাসক ৩০ বছর যাবৎ সামরিক শাসনের মাধ্যমে একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। এ শাসক সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় দেশ ভরিয়ে তোলেন। ফলে সে দেশে তার এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের জোয়ার নামে। পাকিস্তান আমলের শাসক আইয়ুব খানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি পাকিস্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করে এক দশককাল দেশে সামরিক শাসন জারি রেখে একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করেন। তার সময়ে গণতন্ত্রের কবর রচনা, গণবিরোধী অশুভ শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি, সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের অত্যধিক প্রভাব, ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বপাকিস্তানিদের সকল অধিকার আদায়ে অনীহা প্রভৃতি অনাচার প্রকটরূপ ধারণ করে। এ কারণে দেশে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশে মৌলিক গণতন্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। জনগণ যাতে তাদের নিজস্ব বিষয় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে সে সুযোগ সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য বলে দাবি করা হয়।

ঘ উক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ আইয়ুব খানের উক্ত কাজটি অর্থাৎ মৌলিক গণতন্ত্র প্রণয়ন প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক না হওয়ার কারণে এ কাজটি ব্যর্থ হয় এবং গণআন্দোলনের মুখে তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন।

জনগণ যাতে তাদের নিজস্ব বিষয় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে, সে সুযোগ সৃষ্টি করাই মৌলিক গণতন্ত্রের লক্ষ্য বলে দাবি করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জনগণের সরাসরি অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না। তাই এ ব্যাপারে জনগণের সমর্থন না থাকায় এ কাজটি ব্যর্থ হয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই স্বৈরাচারী শাসকচক্র জনগণের শোষণ, অত্যাচার এবং নির্যাতন চালায়। এর প্রতিবাদে বাংলার নিপীড়িত জনগণের আর একটি তেজোদীপ্ত প্রতিবাদ ১৯৬৮ সালের গণঅভ্যুত্থান। আওয়ামী লীগের ছয় দফা আন্দোলন পূর্ব বাংলায় জনপ্রিয়তা অর্জন করার সাথে সাথে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার ভীত হয়ে পড়ে। আইয়ুব- মোনায়েমচক্র আওয়ামী লীগের এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য প্রদেশব্যাপী আওয়ামীলীগ কর্মীদের পাইকারিভাবে গ্রেফতার করেন। এরপর শুরু হয় তাদের ওপর জেল, জুলুম ও অত্যাচার। তখন পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার ওপর ও শুরু হয় সরকারের নির্যাতন ও নিপীড়ন।

স্বৈরাচারী সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের দমননীতির বিরুদ্ধে পূর্বে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের তীব্র বিক্ষোভ সমগ্র দেশে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। তখন মওলানা ভাসানী সারাদেশব্যাপী ৬ ডিসেম্বর 'প্রতিরোধ' দিবস পালনের আহ্বান জানান। তিনি পুলিশের প্রতিবন্ধকতা এবং লাঠিচার্জ উপেক্ষা করে গভর্নর হাউস ঘেরাও করেন। এরপর স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের মুখে জেনারেল ইয়াহিয়ার অনুকূলে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

প্রশ্ন ▶৬ ৭ই এপ্রিল ২০১৪ থেকে ভারতের লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এসি নিয়েলসনের সহায়তায় এবিপি নিউজের এক জরিপের ফলাফলে বলা হয় বিজেপি ও এনডিএ এবার অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। নির্বাচনের মূল আকর্ষণ নরেন্দ্রমোদি ও সোনিয়া গান্ধী। পাকিস্তানী আমলের শেষের দিকে এদেশের একটি নির্বাচনের মূল আকর্ষণ ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভূট্টো। তারা উভয়েই চমৎকার বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ◀*শিখনফল-৫*

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি কয়টি আসন পেয়েছিল? ১
খ. মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম কেমন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তোমার পঠিত নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য মূল্যায়ন করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি ১টি আসন পেয়েছিল।

খ মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকার সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের মোট ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন-সহযোগিতা ও জনমত সংগঠনের উদ্দেশ্যে এই সরকার বহির্বিশ্বে সফল কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়।

গ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আমার পঠিত নির্বাচন হলো ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন।

১৯৬৯ সালের প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সেনাপ্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসেই দেশে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। তবে ২৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে তিনি অনতিকালের মধ্যে দেশে একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠন এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দেন। জেনারেল ইয়াহিয়ার ২৬ মার্চ ভাষণ সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনে হলেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এতে সংশয় প্রকাশ করেন। তারা অবিলম্বে নির্বাচনের দাবি জানান। অবশেষে ক্ষমতা গ্রহণের ৮ মাস পর ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই ঘোষণায় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এক ইউনিট প্রথা বাতিল করে ইতঃপূর্বে অবলুপ্ত ৪টি প্রদেশ পুনর্বহাল করেন।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল সার্বজনীন বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের অনুষ্ঠিত প্রথম স্বাধীন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এ নির্বাচনের ফলাফল ছিল যেমন চমকপ্রদ, তেমনি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রেও এ নির্বাচনের প্রভাব ছিল তাৎপর্যমন্ডিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের অপরিসীম ভূমিকা ও প্রভাব ছিল। এ নির্বাচনকে পাকিস্তানের পতন ঘন্টা এবং স্বাধীন বালাদেশের অভ্যুদয়ের বার্তাবাহক হিসেবে গণ্য করা হয়। বস্তুত এ নির্বাচনের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ব পাকিস্তান শাসনের বৈধতা হারায়।

১৯৪৭ সালের পর থেকে বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবাদ দাবি করে আসছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান নানা উপায়ে তাদেরকে দমিয়ে রেখেছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির সে স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয় ঘটে। অপরপক্ষে এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি লাভ করে। এ অবস্থায় পশ্চিমা শাসকরা নির্বাচনী বিজয়কে নস্যাতের চক্রান্ত শুরু করলে বাঙালি জাতি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসে নিজেদের স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

তাই বলা যায় যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বীজ নিহিত ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৭ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে মি. তারেক বিপুল ভোটে জয়ী হয়। এই জনসমর্থন দেখে শওকত সাহেব নানা মন্তব্য করলেন, একটি জাতীয় নির্বাচনে একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেও ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় সরকার গঠন করতে পারেনি। তবে এ নির্বাচন আমাদের দেশের স্বাধীনতার বিজয় ছিনিয়ে আনার অনুপ্রেরণা দেয়। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. কত সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন হয়? ১

খ. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রশাসনিক বৈষম্য বর্ণনা কর। ২

গ. শওকত সাহেব অতীতের যে নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেছেন তা কোন নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত নির্বাচন বাঙালিকে কীভাবে স্বাধীনতার বিজয় অর্জনের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

খ ১৯৪৭ সালে করাচিতে রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় সকল সরকারি অফিস আদালতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ব্যাপকহারে চাকরি লাভ করেন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হয়েছে। পাকিস্তান আমলে দুই অঞ্চলের প্রশাসনিক বৈষম্যও ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২০০০ কর্মকর্তার ২৯০০ জন কর্মকর্তা বাঙালি ছিলেন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানে যে মন্ত্রণালয় গঠিত হয় তার বেশিরভাগ শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাগণ পশ্চিম পাকিস্তানের ছিলেন।

গ শওকত সাহেব অতীতের যে নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেছেন তা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে মি. তারেকের অনুরূপ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় সরকার গঠন করতে পারেনি। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন এবং ৭টি সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আবার পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এ নির্বাচনে জয়লাভ করায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়া ছিল ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শওকত সাহেব ১৯৭০ সালের নির্বাচনের স্মৃতিচারণ করেছেন।

ঘ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানার সূত্র ধরেই বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৭০-এর বিজয়ে বলীয়ান হয়েই বাঙালির মনে আত্মপ্রত্যয় জন্মে যে, তারা দেশ জয়ের সংগ্রামে বিজয়ী হবে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি লাভ করে এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৯৭১ সালে পূর্ণতা প্রাপ্ত এ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তাছাড়া ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়কে বাঙালি জনগণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় বলে উল্লসিত হয় এবং আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠে। এ নির্বাচন বাঙালি জনগণকে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির চেতনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়— যা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চেতনা হিসেবে কাজ করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের এবং পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। দুটি দলই অঞ্চলভিত্তিক দলে পরিণত হয় এবং নিজেদের কর্মসূচি ও দাবি-দাওয়ার প্রতি অনড় থাকে। যা পাকিস্তানের ভাঙনকে ত্বরান্বিত করে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রাকে সহজ করে দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর দুঃশাসন ও শোষণের হাত হতে বাঙালি জাতির স্বাধিকার ও মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষারই বহিঃপ্রকাশ।

প্রশ্ন ▶ ৮ পারস্য সম্রাট নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন ১৭৩৮ সালে। মুঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহ পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। নাদির শাহ দিল্লিতে প্রবেশ করেন। দিল্লির অধিবাসীরা নাদির শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় তার সেনাদল বহু সংখ্যক দিল্লিবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। নারীদের ওপর চালানো হয় পাশবিক নির্যাতন। ◀ *শিখনফল: ৭*

ক. কে প্রথম পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন? ১
খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কী? ২
গ. নাদির শাহের নৃশংস কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পাক-বাহিনীর কোন কর্মকাণ্ডের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত কর্মকাণ্ডের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল? ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন।

খ ১৯৬৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে যে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা করে তাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের দমন-পীড়ন সহ্য করতে না পেরে বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বিপ্লবের চিন্তা করেন এবং একপর্যায়ে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় গিয়ে কংগ্রেস নেতা ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সাথে মিলিত হয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু শীঘ্রই এ ঘটনা গোয়েন্দা সংস্থার কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার মামলা করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

গ নাদির শাহের নৃশংস কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পাক-বাহিনীর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যার মিল রয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়। সে সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনগণের ওপর হামলা করে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৫ মার্চ এ অভিযান পরিচালনা করলেও মূলত মার্চের প্রথম থেকেই তারা এর পরিকল্পনা করে। সব প্রস্তুতি শেষে ২৫ শে মার্চকেই বেছে নেওয়া হয়। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ঢাকা শহরের মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়। গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আক্রমণ শুরু হয় তার নেতৃত্বে। ২৫ মার্চ রাতে একইভাবে তারা পুরনো ঢাকা, কচুক্ষেত, কলাবাগান, মিরপুর প্রভৃতি স্থানে গণহত্যা চালায়। এছাড়া তারা ঢাকার পাশাপাশি দেশের অন্যান্য জায়গায় গণহত্যা শুরু করে। ঐ রাতেই পাকিস্তানি সেনারা বহু বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করে। তাদের এ বাঙালি নির্বযন অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দিল্লির অধিবাসীরা নাদির শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় তার সেনাদল বহু সংখ্যক দিল্লিবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সুতরাং বলা যায়, নাদির শাহের উক্ত কর্মকাণ্ডের সাথে পাক-হানাদার বাহিনীর ২৫ মার্চ রাতের গণহত্যার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উক্ত কর্মকাণ্ডের তথা ২৫ মার্চ রাতের গণহত্যার শেষ পরিণতি হিসেবে বাঙালি জাতি দীর্ঘ ২৪ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে স্বাধীন হয়।

২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যা শুরু হলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তা ওয়্যারলেস যোগে পাঠিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা শোনামাত্রই চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। শুরু হয় পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে বাঙালি পুলিশ, আনসার ও সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত। বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

বাংলাদেশ হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে প্রথম দেশ, যে দেশ সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পূর্ব বাংলার জনগণ সর্বপ্রকার অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য, জাতি নিপীড়নের শিকার হয়েছে। কিন্তু এ ভূ-খণ্ডের সংগ্রামী মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুঁখে দাড়ায়। দীর্ঘ নয়মাস ১৯৭১ সালের ১৬ মহান মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে এর সফল পরিসমাপ্তি ঘটে।

সুতরাং বলা যায়, উক্ত কর্মকাণ্ড অর্থাৎ ২৫ মার্চ রাত বাঙালি জাতির জন্য এক বেদনাবিধুর রাত হলেও এর শেষ পরিণতিতে স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন পূরণ হয়।

প্রশ্ন ▶ ৯ ১৯৭১-এর মার্চ মাসের সময়টা ছিল ভয়ঙ্কর। তারপরও সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে পাকিস্তান রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের কয়েকজন দুঃসাহসী কর্মকর্তা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঐতিহাসিক একটি ভাষণ সম্প্রচার করেছিলেন। অগ্নিঝরা সেই ভাষণের বিষয়বস্তু পৌঁছে গিয়েছিলো বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে। এ ভাষণের মধ্য দিয়েই বাঙালির নেতা পাকিস্তান সরকারের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেন। এ ভাষণে বাঙালির স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষাকে আরও উস্কে দিয়েছিল। আগুন ধরিয়েছিল জনগণের মনে। ◀ *শিখনফল-৭*

ক. ৭০-এর নির্বাচনে পিপিপি প্রধান কে ছিলেন? ১
খ. পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানিদের অবস্থা আলোচনা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ঐতিহাসিক ভাষণের কথা বলা হয়েছে? উক্ত ভাষণের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৭০-এর নির্বাচনে পিপিপি প্রধান ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো।

খ পাকিস্তানিরা কাশ্মীর সীমান্তের ছামর সেক্টরে সাফল্য লাভ করলেও অন্যত্র পরাজিত হতে থাকে।

৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান বাহিনী কাশ্মীরের ভারতীয় অংশ আক্রমণ করলে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের প্রথম থেকেই ভারতীয় বাহিনী প্রাধান্য বজায় রাখতে শুরু করে। ভারতীয় সৈন্যরা আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে লাহোর শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বাঙালি সৈন্যরা ভারতের এ আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়ে শৌর্যবীর্যের এক ইতিহাস সৃষ্টি করে। ১৭ দিন ব্যাপি যুদ্ধ চলার পর জাতিসংঘের নির্দেশে যুদ্ধ বিরতি হয়।

গ উদ্দীপকে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের কথা বলা হয়েছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে পাকিস্তানের সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থানে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। দেশব্যাপী নানারকম উদ্বেগ, উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের মূল বিষয় ছিল চারটি। প্রথমত, চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার করা। দ্বিতীয়ত, সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া। তৃতীয়ত, গণহত্যার তদন্ত করা। চতুর্থত, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। ইতোপূর্বে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক আলোচনার জন্য ১০ মার্চ ঢাকায় বৈঠক অনুষ্ঠানের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা প্রত্যাখ্যান করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ শর্তগুলো আরোপ করেন।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ্য করি পাকিস্তান রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের কয়েকজন দুঃসাহসী কর্মকর্তা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঐতিহাসিক একটি ভাষণ সম্প্রচার করেছিলেন। অগ্নিঝরা সেই ভাষণের বিষয়বস্তু পৌঁছে গিয়েছিল বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে। এই ভাষণের সাথে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের কথা বলা হয়েছে। এই ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। এ ভাষণ সারাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তাদের উদ্বুদ্ধ করে ঐক্যবদ্ধ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে দেশের জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তার নির্দেশ অনুসারে দেশের স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তান বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ১৩ মার্চ সরকার সামরিক আইন জারি করেন। ১৪ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো একটি অবাস্তব প্রস্তাবের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ফর্মুলা দেন। আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনসাধারনকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন। এরপর ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক শুরু হয়। কিন্তু বৈঠক অসমাপ্ত রেখে ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করার আগে গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে যান। যার ফলে ২৫ মার্চ মধ্য রাতে বাঙালির ওপর নেমে আসে চরম আঘাত। এভাবে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। অর্জন করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক একটি ভূ-খণ্ড।

তাই বলা যায় যে, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক নির্দেশনা।

প্রশ্ন ▶ ১০ আজ বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য দিন। ৭১-এর এই দিনে রেসকোর্স ময়দানে এক অসাধারণ কবিতার সৃষ্টি হয়েছিল যে কবিতা শোনার জন্য কারখানা থেকে এসেছিল লোহার শ্রমিক, লাঙল জোয়াল কাঁধে নিয়ে এসেছিল কৃষক, এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক, নারী, বৃদ্ধ, ভবঘুরে, পাতা কুড়ানিরা দলবেঁধে। অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', এই কবিতার পটভূমি, গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। দেশপ্রেমী বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিল।

◀ শিখনফল-৭

ক. পাকিস্তানি শাসনামলে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর কোথায় ছিল? ১

খ. শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়টি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল? পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়টি দেশপ্রেমী বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিল— এ বক্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানি শাসনামলে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।

খ পশ্চিম পাকিস্তান পরিকল্পিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোনো বরাদ্দ করা হয়নি। ১৯৫৫-১৯৬৭ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ২০৮৪ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭৯৭ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়।

গ উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

যখন ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল তখন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণে তিনি চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলেন। এছাড়াও এ ভাষণে তিনি গণহত্যার তদন্ত করা এবং নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা বলেন। এ ভাষণে তিনি কৌশলে প্রত্যক্ষভাবে ঘোষণা না করে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন,

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।" তিনি আরও বলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।" তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান, "ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।"

উদ্দীপকে বলা হয় আজ বাংলাদেশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য দিন। এতে বলা হয় একটি কবিতার কথা এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই ঐতিহাসিক কবিতার সাথে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের সামঞ্জস্য বিদ্যামান।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত বিষয় অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা বলা হয়েছে, যা দেশপ্রেমী বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিল।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। এ ভাষণ সারাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। তার নির্দেশে সকল অফিস আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকায় ১৩ মার্চ সরকার দ্বিতীয় বারের মতো সামরিক আইন জারি করে। ১৪ মার্চ পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এক অবাস্তব প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার ফর্মুলা দিলে বঙ্গবন্ধু তা প্রত্যাখ্যান করে ৩৫ দফা দাবি জারি করেন এবং জনগণকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ইয়াহিয়া খান প্রহসনমূলক আলোচনার জন্য ঢাকা এসে ঢাকা ত্যাগ করার আগে সামরিক বাহিনীকে বাঙালির ওপর আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। শুরু হয় বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করে তারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করে।

পরিশেষে বলা যায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ১১ উত্তর ভিয়েতনামি জনগণের নিপীড়িত হওয়ার প্রেক্ষিতে ভিয়েতনামের অবিসংবাদিত নেতা হো চি মিন ১৯৬৭ সালে হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উত্তর ভিয়েতনাম অঞ্চলের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ৯ দফা পেশ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসন, দায়িত্ব, অর্থব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সেখানে পেশ করা হয়। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলা হয় কোন কর্মসূচিকে? ১

খ. উনসত্তরের গণ আন্দোলন কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের হো চি মিন চরিত্র বাংলাদেশের ইতিহাসের কাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উত্তর ভিয়েতনাম অঞ্চলের ৯ দফার মতো ছয়দফা দাবি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ- উক্তিটি ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলা হয় ছয়দফা কর্মসূচিকে।

খ উনসত্তরের গণ আন্দোলন ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তা এক সময় ছাত্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়ে শহর ও গ্রামের শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের মাঝে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গড়ে উঠে এক দুর্বার আন্দোলন, যা ১৯৬৯ সালে গণ আন্দোলনে রূপ নেয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বর্ণনা কর।

ঘ ছয়দফা দাবি বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ▶ ১২ পাকিস্তান আমলে স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঘৃণা ও প্রহসনমূলক একটি মামলা করেছিলেন পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নামে। পূর্ব বাংলাকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল ও নেতৃত্বশূন্য করে এ অঞ্চলে আইয়ুব খানের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাথায় রেখেই এই মামলাটি করা হয়েছিল। তবে গণদাবির মুখে শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খানের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন কে? ১

খ. ২১ দফার প্রধান তিনটি দফা লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত মামলার বিষয় প্রক্রিয়াটি সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত মামলার ফলাফল ও গুরুত্ব পর্যালোচনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

খ ২১ দফার প্রধান তিনটি দফা হলো:

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করা ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ।

৩. পাট শিল্পের জাতীয়করণ করা।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ আগরতলা মামলা সম্পর্কে লেখ।

ঘ আগরতলা মামলার ফলাফল ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।